দৈনিক সংবাদ
তারিখ 22 APR 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৭

১০ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার আন্দোলন

মও. হোসেন আলী

দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার জন্য বেশকিছু বর্ধিত কার্যক্রম বিগত বিএনপি সরকারের আমল থেকে শুরু হয়েছে এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এসব কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এবার সরকার ঘোষণা দিয়েছে আগামী দশ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে।

সরকারি ঘোষণাগুলো অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এসব ঘোষণার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম খামখেয়ালিপনার অবকাশও থেকে যায়। প্রথমেই এ ব্যাপারে একটা পরিচ্ছন্ন গণসচেতনতা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। সাক্ষরতা বলতে আমরা কি বুঝি তাও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন সকলের। আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকও মনে করেন যে নিজের নাম লিখতে পারাই সাক্ষরতা। অতীতে এরূপ স্বাক্ষরতার অভিযান বা টিপসহিমুক্ত করার অভিযান দেশে পরিচালিত হয়েছে। সুতরাং অনুরূপ অভিযানের অনুসরণে যদি নাম দস্তখত শেখানোর সাক্ষরতা অর্জন লক্ষ্য হয় তবে একটা সহজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১০ বছর বা পাঁচ বছরের একটা সময়সীমার মধ্যে দেশের কয়েক কোটি নিরক্ষর মানুষকে নাম দস্তখত শিখিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা গেলেও যেতে পারে। কিন্তু সার্বজনীন সাক্ষরতার ব্যাপারটা এ রকম নয়। এর সাথে মৌলিক শিক্ষার সম্পর্ক জড়িত। সাক্ষর ব্যক্তি বলতে আমরা মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকেই বুঝব।

দেশবাসীকে অনুরূপ শিক্ষিত একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়েই আমাদেরকে এগুতে হবে। যদি আমরা দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার কথা বলি বা সার্বিক সাক্ষরতার কথা বলি। আর সে জন্য একটা সম্মিলিত কার্যক্রম প্রয়োজন। যা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন হবে আমাদের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ।

আমাদের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে হাল তাতে মনে হয় না লক্ষ্যে উপনীত হওয়া খুব সহজ। বিগত ৫০ বছরে আমাদের সাক্ষরের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫ শতাংশের কম। আগামী দিনে কি জাদুর প্রদীপের সন্ধান আমরা পেয়ে যাব যার দ্বারা ১০ বছরে এটা ৬৫% বাড়ানো সম্ভব হবে? সম্ভবত এমন কিছুই আমরা পাব না। অন্তত ব্যবস্থা ও উদ্যোগে এমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। উপর্যুপরি তথ্য বিভ্রান্তির পরিমাণ বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যে এনরোলমেন্ট দেখানো হচ্ছে তা অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ নয় বলে সরেজমিন তদন্ত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচিতেও দেখা যায় স্কুলগুলোতে পাঠদানের মান খুব নিম্ন পর্যায়ে চলে গেছে এবং স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুদের অনেকেই সাক্ষরতা অর্জন না করেই স্কুল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও শোনা যায় স্কুলে গম দেয়া হচ্ছে ঠিক ঠিক মতই; কিন্তু লেখা-পড়া একেবারেই ঠিক ঠিক মত হচ্ছে না।

এর ফলে কাগজেপত্রে সাক্ষরের সংখ্যা বাড়লেও বাস্তবে শিশুদের মধ্যেই নিরক্ষর থেকে যাচ্ছে বিপুল সংখ্যক। এটা ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে বিপুল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটার পূর্বাভাস। সার্বজনিন সাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জন করতে হলে একশত ভাগ শিশুকে স্কুলগামী করা প্রয়োজন। স্কুলে ভর্তি হওয়া সকল শিশু যাতে সাফল্যের সাথে পঞ্চম শ্রেণী অতিক্রম করে বের হতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এটা করতে হলে স্কুলের সংখ্যা বাড়ানোর প্রশ্নটা তো আছেই; সর্বাগ্রে অবশ্যই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সে ব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা করার স্থান এখানে নেই। তবে এটা বলে রাখা যায় যে, শুধুমাত্র এনরোলমেন্ট বাড়ানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করে এটা হবে না। এ জন্য আরো অনেক কিছু করতে হবে।

বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার জন্য যে পরিমাণ নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন সেটি আপাতত একটি কঠিন ও ব্যয়বহুল বিষয়। এজন্য বেসরকারি স্কুল, স্যাটালাইট স্কুল এবং উপানুষ্ঠানিক স্কুল কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের গৃহীত উদ্যোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা ইতোমধ্যে এ কাজে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। এগুলো মৌলিক শিক্ষা সম্প্রসারণের শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থার পরিপূরকের ভূমিকাই পালন করবে না, এগুলো এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক সময় আশংকা করে বলে থাকেন দ্বৈত এনরোলমেন্টের কথা। অনুরূপ আশংকার দ্বারা তাড়িত হয়ে শিশুদের জন্য বিদ্যালয় সংকোচননীতি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন করে ওই সমস্যার সমাধান করা খুবই সহজ এবং এভাবে বাধ্যতামূলক মৌলিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করে তোলা যেতে পারে।

এর পরই আসে বিদ্যালয়গমনের বয়সোত্তীর্ণ ও ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের সাক্ষরতা প্রদানের বিষয়টি। এই কর্মসূচি এগিয়ে নেয়ার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় প্রশাসন নিজ নিজ উদ্যোগে কিছু কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টায় কিঞ্চিৎ অগ্রগতিও আছে। কিন্তু এটি একটি বিপুল আয়তন কাজ এবং খুব সহজ একটা কাজ নয়; যেহেতু এটি নাম দস্তখত শেখানোর মতো একটি কাজ নয়।

এই কার্যক্রমকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে অবশ্যই একে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। শিক্ষা বিস্তার সর্বতোভাবে একটি অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাত্রার ওপর যেমন নির্ভর করে, এর বাস্তবায়ন তেমনি অর্জিত শিক্ষার কার্যকারিতার ওপর অনিবার্যভাবে নির্ভর করবে অংশগ্রহণের মাত্রা। এজন্য সরকারি এবং বেসরকারি সফল উন্নয়ন কর্মকান্ডকে শিক্ষার সাথে অধিকতর সম্পর্কিত করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। সফল উন্নয়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যেতে হবে মানব সম্পদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে এবং এই মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে দেশের এগার কোটি মানুষের মধ্যে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হচ্ছে একটি দক্ষ শিক্ষাকর্মী বাহিনীকে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা। এজন্য প্রফেশনাল, প্যারা প্রফেশনাল ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সাথে সাথে তাদের কাজের মূল্যায়ন, প্রণোদনা প্রদান এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থাও করতে হবে। এসব ক্ষেত্রেও শিক্ষার গুণগত মানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

সরকার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে। এটা নতুন কিছু নয়। এর আগেও অনেক সরকার এমন ঘোষণা দিয়েছে। নতুন কথা বা প্রণিধানযোগ্য কথা হবে তখনই যখন সরকার রাজনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে জনগণকে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাতে সক্ষম হবে। এই সাথে একটা সিদ্ধান্ত এই সরকারকে খুব স্পষ্টভাবে নিতে হবে যে, সরকার কি এই বিষয়টাকে তার রাজনৈতিক প্রচার প্রপাগান্ডার বাহন করতে চায়, নাকি প্রকৃত পক্ষেই শিক্ষার সম্প্রসারণ চায়। আমরা আশা করব বর্তমান সরকার শেষোক্তটিই চায়। আর তা হলেই শিক্ষা বিস্তার বা নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে কোন সস্তা চমক সৃষ্টি করতে না পারলেও কার্যকর সাফল্য কিছু আসবেই।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বাস্তবানুগতা এবং শিক্ষা কর্মী ও শিক্ষক সমাজের দক্ষতা ও আন্তরিকতার উৎকর্ষ সাধন করতে না পারলে সকল হৈ চৈ বিফলে যাবে। সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এখানে সরকারের একটা প্রধান পদক্ষেপ হওয়া উচিত প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রশ্ন উঠতে পারে সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা- যার বিনিয়োগের পুরোটাই অনুদান-নির্ভর এবং দাতব্য, সেখানে প্রতিযোগিতার পরিবেশ কি গড়ে উঠবে?

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রতিযোগিতা প্রয়োজন এবং তা গড়ে উঠছেও। এক্ষেত্রে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর উদ্ভাবিত ব্যবস্থা সরকারি ব্যবস্থার প্রতিযোগী হয়ে উঠতে সক্ষম এবং উপানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার কিছুটা হলেও প্রতিযোগী হয়ে উঠতে সক্ষম। সরকারের উচিত হবে একটি সুষ্ঠু ও নিরীক্ষণধর্মী প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

পরিশেষে একটি কথা আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে। শিক্ষা বিস্তার হচ্ছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি উন্নয়ন কার্যক্রম। এটি সর্বাধিক লাভজনক, তবে এর রিটার্ন যথেষ্ট বিলম্বিত এবং দীর্ঘ অর্জনসাপেক্ষ। খুব সস্তায় এবং হেলাফেলায় সর্বজনীন শিক্ষা বিতরণের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে কাজ করলে অত্যন্ত ভুল পরিকল্পনা করা হবে। খুব সস্তায় কয়েক বছরের মধ্যে দেশটাকে নিরক্ষরমুক্ত করে ফেলার পরিকল্পনা নেয়া হলে ফলাফলে সস্তার তিন অবস্থাই পাওয়া যেতে পারে। এমন কোন সস্তা কারবার নয়। আমরা আশা করব সরকার দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে কার্যকর সাক্ষরতার অধিকারী একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবে।